১৭৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 JUL 1995

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের একটি নাটকীয় অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। এই অধিবেশন নিয়ে সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন এবং রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বক্তব্য-বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার দুর্গ নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার দগদগে ক্ষতকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে। একজন সিনেট সদস্য হলেও স্বনামে আমি এই লেখাটি লিখতে পারছি না, কারণ আমার ঘাড়ে যে একটা মাত্র মাথা। পাঠক বন্ধুরা ভাবতে পারেন সিনেটের মতো একটি সম্মানজনক সংস্থার সদস্য হয়েও আমি কেন সাহস করে ভিতর থেকে দেখা ঘটনার বিবরণ

জামান মাহমুদ

পিতৃপ্রদত্ত নামে বয়ান করতে সাহস পাচ্ছি না। তার আভাস একটু আগেই দিয়েছি। আর একটু খোলাসা করে বলি। আমার পেশী শক্তি নেই, বুকের পাটা যা একটু আছে তাও পিস্তল বা কাটা রাইফেলে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। অতএব স্ত্রীপুত্রদের অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে লাশ হয়ে অসময়ে ঘরে ফিরতে চাই না। অতএব ছদ্মনামের আড়ালে আশ্রয় না নিয়ে উপায় কি?

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটেও এমন ঘটনাই ঘটল। শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি ডাকসু প্রতিনিধিরা (পাঁচ বছর আগে নির্বাচিত ডাকসু এখনও আছে—হায় সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!)। এই ধরনের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, তার মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত নিয়ে কোন বিশ্লেষণমূলক বিতর্ক হয়নি বা হতে পারেনি। নীরস, একঘেয়ে ও রাজনৈতিক বিষয়ে বাক-বিতণ্ডাই হয়েছে বিস্তর। সিনেট যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্লামেন্ট, জ্ঞানীগুণীরা এর সদস্য হওয়ায় এখানকার বক্তৃতার মান যে অত্যন্ত উন্নত, পরিশীলিত, যুক্তি তথ্যনির্ভর হওয়ার কথা তা হয়নি। এখানকার ভাষণ-বক্তৃতা দৈনন্দিন রাজনৈতিক কোন্দলের ভাষার ঊর্ধে উঠতে পারেনি। প্রথম দিনের অধিবেশনে উপাচার্য মহোদয় বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক গণতান্ত্রিক ব্যাপারকে পুরোপুরি গ্রহণ করে না। এটাতে অন্য রকম বৈশিষ্ট্য আছে। কিছুটা এলিটিস্ট। যেমন ভর্তি হতে ছাত্রদের মেধা লাগে, শিক্ষক হতে গেলে চারটা ফার্স্ট ক্লাস লাগে ইত্যাদি। উপাচার্যের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। তিনি যা বলেছেন, তাতে বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ারার্কির কথা বুঝিয়েছেন। এটাও গণতন্ত্রের অংশ। শিক্ষক হতে গেলে চারটা প্রথম শ্রেণী লাগবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নিয়ম বা কনভেনশন হওয়ার কথা। এটা হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিকভাবে শিক্ষক বাছাইয়ের একটা নীতি। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়তো জ্ঞানচর্চা ও গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। সে অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক না হলে আর কোন্ প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক হবে! গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তির জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের তৃতীয় ও শেষ দিনটিই ছিল যেন সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, ঘটনাবহুল, নাটকীয় এবং মন্ত্রী-সাংসদসহ সম্ভাব্য সকল সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ। কারণ ঐ দিন সিন্ডিকেটের তিনজন ও ফিনান্স কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনে বিভিন্ন দলীয় প্রভাব থাকবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হলো সিনেট অধিবেশন আর কিছুর জন্য নয় ঐ নির্বাচনটার জন্যই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম দুইদিন যাঁরা আসেননি— তার কারণ অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছে সিনেটে মূল্যবান, দিকনির্দেশক, উঁচুমানের চিন্তা উদ্দীপক বক্তৃতা দিয়ে সিনেটকে কার্যকর ও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া নয়, কোন রাজনৈতিক দলের ইন্ধন যোগানোর জন্যই ওই দিন তাঁদের অমন নিখুঁত উপস্থিতি। শিক্ষাভাবনার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে তাঁরা আসেননি। অনেকের সে রকম চিৎপ্রকর্ষ থেকে উৎসারিত শিক্ষা, সামাজিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব প্রভৃতির সম্পর্কে মিথষ্ক্রীয়া থেকে উদ্ভাবিত

কোন প্রযত্ন লালিত চিন্তা ও মেধা লক্ষ্য করা যায়নি— উদ্ভাবনাময়, কৌতূহল উদ্রেককারী তত্ত্ব বা প্রকল্প প্রস্তাবও কেউ উপস্থাপন করেননি। ফলে সিনেট অধিবেশনটি জাতীয় সংসদ অধিবেশনের মতোই নিষ্ফলও হয়ে ওঠে। অথচ সিনেট অধিবেশন চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বিচিত্র মাত্রিকতা পেতে পারত। পাশ্চাত্যের উত্তর আধুনিক চিন্তাভাবনা ও সেক্ষেত্রে জ্ঞান ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার কথা বিচার-বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় নির্ধারিত হতে পারত, অন্যদিকে চীন-জাপানসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা হতে পারত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। অথচ এর কিছুই হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষাক্রম, পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক, বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অগ্রাধিকার, নারী শিক্ষার নতুন গতিশীলতা ও লক্ষ্য—এগুলো আলোচনায় এলো না। এমনকি সদস্যরা যেসব প্রস্তাব ও প্রশ্ন লিখিতভাবে জমা দিয়েছিলেন তাও চাপা পড়ে থাকল নির্বাচনের চাপে।

নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই। গণতন্ত্রেরও প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি নির্বাচন। কিন্তু সিনেটের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমস্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আগে, তারপরে নির্বাচন। কারণ এ নির্বাচন কোন বড় নির্বাচন নয়—জনমতের সচেতনতায় সহায়ক কিছুও নয়। কমিটি নির্বাচন মাত্র। এর গুরুত্ব তত নয়— তবে এর সুযোগ-সুবিধা বা পক্ষপাতের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তাই এর একটা আকর্ষণও আছে বিশেষ গোষ্ঠী, দল বা ব্যক্তির কাছে।

এই সুবিধার দিকে নানা স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও চক্রের লক্ষ্যটা ঝুঁকে থাকায় বড় ন্যক্কারজনক সব ঘটনা ঘটল। নিয়মনীতি বিধি স্ট্যাটিউটের তোয়াক্কা করা হলো না। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে যে কোন উপায়ে ঐ নির্বাচনে জেতাটাই হলো মূল উদ্দেশ্য। যে কোন নির্বাচনে ভোটার থাকে —সুস্পষ্ট ও পূর্ব প্রচারিত সুনির্দিষ্ট ভোটার তালিকা থাকে। এই তালিকা নির্বাচনের বেশ আগে করা হয় এবং ভোটাররা সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে অবহিত থাকেন। কিন্তু মজার ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে এবার দেখলাম মাদারীর খেল্। ২৮.৬.৯৫-এ শুরু হলো সিনেট সভা। আমরা যারা সিনেটর হিসাবে সিন্ডিকেট ও

সিনেটে যা ঘটল

ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য নির্বাচনের ভোটার, তারা ভোটার তালিকা দেখলাম ও তাতে নিজ নামের বিপরীতে সই করে শীতকযন্ত্র সংযুক্ত সিনেটের শীতল কক্ষে ঢুকে আরামবোধ করলাম। বিতর্ক বিতণ্ডায় দিনটা কাটল— কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই শুরু হলো নিয়মনীতির চরম লঙ্ঘন। এক ভদ্র মহিলা হলে ঢুকলেন। বলা হলো, ইনি কে? এর নামতো সিনেটরদের তালিকায় নেই। তাছাড়া কেউ কেউ বললেন- ইনিতো বিগত সিনেট নির্বাচনে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি হিসাবে চরমভাবে পরাজিত হয়েছেন। উপাচার্য ও সিনেট চেয়ারম্যান বললেন - অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন বিদেশে গেছেন, তাঁর জায়গায় ইনি চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি হিসাবে সিনেটে মনোনয়ন পেয়েছেন। সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন - এটা হয় না। এটা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ৭৩ (৫৪ ধারা) ও সিনেট রুলসের চরম লঙ্ঘন। অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন বিদেশে আছেন। তিনি পদত্যাগ করেননি। তাঁর আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়নি। এমতাবস্থায় এই মনোনয়ন অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে অচল। উপাচার্য বললেন ঃ "আমি কিছু বলতে পারব না তিনি চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি, তিনি সিনেটে বসবেন। আমার কিছু করার নেই।" সদস্যরা হৈ চৈ করলেন। ঘোরতর অনিয়ম হিসাবে একে আখ্যা দিলেন কেউ কেউ। একজন বললেন চ্যান্সেলর কি পরাজিত সদস্য ছাড়া আর কোন উপযুক্ত সদস্যকে পেলেন না! ঘৃণ্য দলীয়করণ, 'ধিক'! কেউ বললেন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের লঙ্ঘন। আমি মনে মনে বললাম ঃ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে এভাবে সরকারী মদতে পিছনের দরজা দিয়ে ছাড়পত্র যোগাড় করতে একটুও লজ্জা হলো না।

শেষ দিন অর্থাৎ নির্বাচনের দিন সিনেট কক্ষে তিল ধারণের ঠাঁইও নেই। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাহানারা বেগম, পরিকল্পনামন্ত্রী ড. মঈন খান, লেখক হুমায়ুন আহমদ সবাই ওই দিন হাজির। এঁরা সিনেট সদস্য, এঁরা আসবেন জানা ছিল। এলেন না শুধু সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক। আমরা ভাবলাম ব্যাপারটা কি! এই অনুপস্থিতি কেমন করে হতে পারে! বলতে বলতেই সভা কক্ষে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। উপাচার্য বললেন ঃ স্পীকার এম.পি. প্রতিনিধি হিসাবে শাজাহান মিয়াকে পাঠিয়েছেন আমিনুল হকের পরিবর্তে। সদস্যদের মধ্যে অনেকে বললেন ঃ 'তিনিতো সিনেটর নন'। উপাচার্য বললেন ঃ তাঁর নাম হাতে লিখে দেয়া হয়েছে। সদস্যদের অনেকে জোরালোভাবে বললেনঃ কিছুক্ষণের মধ্যে নির্বাচন শুরু হবে। এখন আপনি এভাবে হাতে লিখে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে পারেন না। এটা কারচুপি। আমিনুল হক দেশেই আছেন, তবে ঢাকার বাইরে। তাঁর জায়গায় অন্য একজন "প্রক্সি" দিতে পারেন না। উপাচার্য বললেন, আমার কিছু করার নেই, শাজাহান মিয়া এমপি, স্পীকারের নমিনি। একজন শিক্ষক ক্যাটেগরির সিনেট সদস্য বললেন, আমাদের চারজন সদস্য বিদেশে, তাঁদের জায়গায়ও তাহলে প্রক্সি দেবার সুযোগ দেন। উপাচার্য উত্তর দিলেন না এবং নির্বাচনের জন্য প্যানেল আহ্বান করলেন। দু'পক্ষ থেকেই প্যানেল দেয়া হলো। উপাচার্য ব্যালট তৈরি ও নির্বাচন প্রস্তুতির জন্য এক ঘণ্টার জন্য অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করলেন।

রাত ৭-৫০ মিনিটে যখন সভা শুরু হয় তখনই সভা ভেঙ্গে যাওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু। দেখা গেল সভায় উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক এরশাদুল বারী। জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগে তিনি শিক্ষকদের সকল সভাসমিতি থেকে "অবাঞ্ছিত" ব্যক্তি হিসাবে বহিষ্কৃত। শিক্ষক সমিতি এ বয়কট তুলে নেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শিক্ষকদের এ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আসছেন। কিন্তু এইদিন তা দেখালেন না। তবে কর্তৃপক্ষের নৈতিক সঙ্কটটা সামনে এলো অন্যভাবে। বারী যে শিক্ষকদের অভিযোগে যথার্থই দোষী প্রমাণিত তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল যখন উপাচার্য ঘোষণা করলেন, বারী উপস্থিত থাকবেন। কারণ তিনি চ্যান্সেলরের নমিনি। তাকে আমি বের হয়ে যেতে বলতে পারি না। তিনি ভোটে অংশ নেবেন না। উপাচার্য উভয় দিক রক্ষা করতে চাইলেন। হয়ত এতে সূক্ষ্ম কৌশলও থাকতে পারে, যেমন অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বলেছেন, তাঁর মতে বারীকে উপস্থিত রেখে ভোট দিতে না দিলে হেরে গেলেই ওরা এই একটি কারণ দেখিয়েই মামলা করতে পারবেন। এখানে সেই সুযোগটিই সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে।

একটা কথাই বার বার মনে হয় ঃ সরকার কি "স্বাধীনতাবিরোধী" হিসাবে অভিযুক্ত ছাড়া মনোনয়ন দেয়ার লোক খুঁজে পায় না? নাকি ইচ্ছা করে দেশবাসীকে এভাবেই অপমান করে বার বার। সিনেট অধিবেশনে রেজিস্টার্ড প্রতিনিধি শামসুজ্জামান খান সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দে দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং মাদ্রাসার জন্য ২০২ কোটি টাকা বরাদ্দে কি মানসিকতা কাজ করছে তা তুলে ধরেন। তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, একবিংশ শতকে বাংলাদেশ "টাইগার" হিসাবে নয় "বিয়ার" (ভালুক) হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। সে যাই হোক, ৪০ জন সদস্য এরশাদুল বারী ও প্রশাসনকে দলীয়করণের (পাঁচজন সদস্য দুই বড় দলের সমর্থক সিনেটর ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই তিন পক্ষেরই দলীয়করণ) প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সাদউদ্দীন, মুনতাসির মামুন প্রমুখ ছিলেন। হুমায়ূন আহমদ সাদা দলের সদস্য। তিনি

নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই। গণতন্ত্রেরও প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি নির্বাচন। কিন্তু সিনেটের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমস্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আগে, তারপরে নির্বাচন।

বলেন ঃ 'আমিতো শুধু ভোট দিতেই এসেছি। আমি আমার দলের পক্ষে ভোট দেব—প্যানেল ভোট।' অতএব তিনি মোস্তাফিজুর রহমানদের ভোট দেবার জন্য বসে থাকেন। যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁরা শিক্ষক ক্লাবে সভা করে প্রেস ব্রিফিং দেন। সদস্য ওজায়ের ফারুক আইনগত দিক থেকে আপত্তি জানিয়ে মামলা করার কথা বলেন। ওদিকে তখন খালি মাঠে গোল দেয়া চলছে অর্থাৎ নির্বাচন চলছে।